রজনী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য উপপাঠ্যরূপে অনুমোদিত (কলিকাতা গেজেট, ৩রা মে ১৯৫১)

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র অষ্টম গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

Edited by - Nripendra Krishna Chatterji

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার
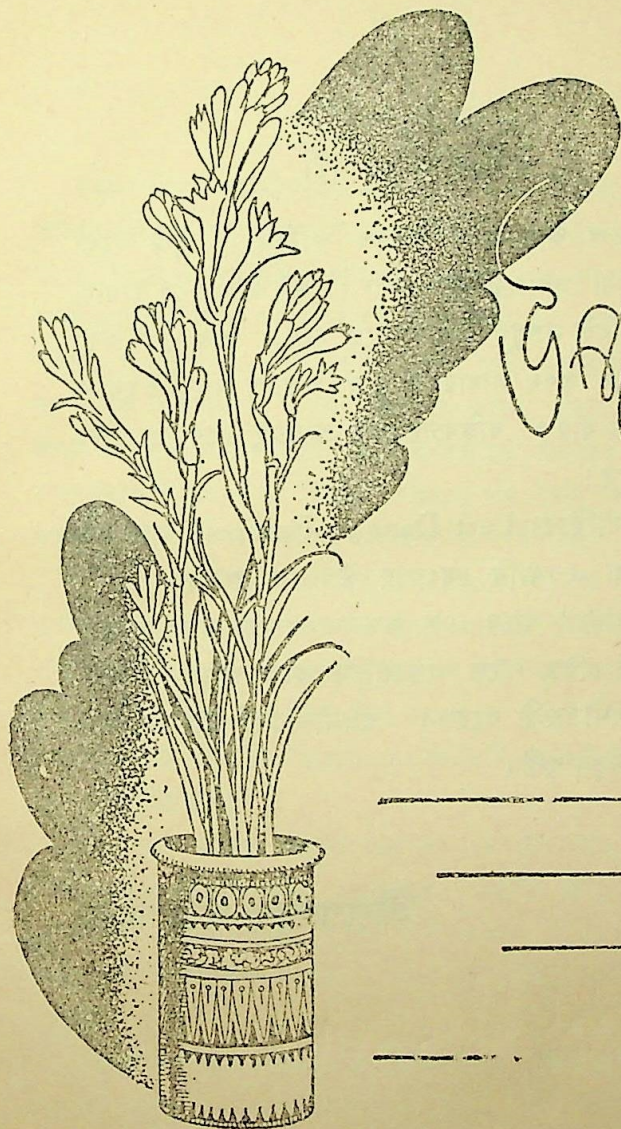
সম্পাদকের ভূমিকা

রজনী এক অন্ধ-মেয়ের সকরুণ কাহিনী। দৃষ্টি হলো মানুষের একটা সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ যে হারায়, তার কাছে পৃথিবী সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। তার দুঃখ-কষ্ট, সুখ-আনন্দবোধ তখন সাধারণ মানুষের অনুরূপ অনুভূতি থেকে কি তফাৎ হয়ে যায়? বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন এই কাহিনীতে।

ইংরেজী-সাহিত্যে Last Days of Pompeii বলে লর্ড লিটনের লেখা একখানি চমৎকার উপন্যাস আছে। সেই উপন্যাসে 'নিদিয়া' নামে এক অন্ধ-ফুলওয়ালীর চরিত্র আছে। নিদিয়ার সেই চরিত্র প'ড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অন্ধ-রজনীর কাহিনী সৃষ্টি করেন। রজনী—নিদিয়ার অনুকরণ নয়, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ থেকে একশো আঠারো বছর আগে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিক্‌টা ভাঙিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এনট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা, সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন…বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এন্‌ট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা, সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয় গৌরব-সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন···বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী-চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্ !"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা···সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম !

—বন্দে মাতরম্ !

———

রজনী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রজনীর কথা

তোমাদের সুখ-দুঃখে আমার সুখ-দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন-প্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব, আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে তাই আলো। না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ-দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র যূথিকা সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম! আমি সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র

পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, ততদিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে-পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমত পিতা-মাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষে ফুল নাই, সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই একপ্রান্তে ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃতি করিয়া, ফুল ছড়াইয়া আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাহিতাম।

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে? তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল; আমি এখন বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা কি দুর্ভাগ্য কি

সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম!"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ংবরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার, অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন—একা-একাই বাবু। মনে-মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেণ্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনর বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবা অবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলনার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ—সেই জন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে ও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস্ না, তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি ?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেক কাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা ?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশ খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ-কালের জটিলাকুটিলা-দিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মা দুই একটা বাড়ীতে ফুল যোগাইতেন; তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা), সাড়ে চারিটা ঘোড়া আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্ণা এবং প্রাচীনা, তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পূরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁর পিতা নাম রাখিয়াছিলেন—ললিতলবঙ্গলতা এবং রামসদয়বাবু আদর করিয়া বলিতেন, "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।" রামসদয়বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী।

নয়ন নাই—ললিতলবঙ্গলতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চার আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, "এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস্ কেন?" কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে

বলিত,—'ও আমার টাকা নয়',—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক রামসদয়বাবুর ঘর না থাকিলে আমাদিগের দিনপাত হইত না।

একদিন মা'র জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যা-ই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ী-ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেকবার পথচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ-কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো, দেখতে পাস্‌নি? কাণা না কি?" আমি ভাবিতাম—"উভয়তঃ!"

ফুল লইয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণি—আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্ কেন?" কাণি বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম; এমন সময় সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে, ছোট মা?"

ছোট মা!—তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র? বড় পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম, সে এমন অমৃত নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া সুধা ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোটবাবু।

ছোট মা বলিলেন,—এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী? আমি বলি-বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোটবাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটি ত' ভদ্রলোকের মেয়ের মত বোধ হইতেছে। তা, ওটি কাণা হ'লো কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোটবাবু। দেখি?

ছোটবাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু (ছোটবাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত' গা!"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোটবাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।" চাব কি ছাই!

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"—বলিয়া আমার দাড়ি ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন। সে স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশে-পাশে ফুল,

আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল—আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি! আ মরি-মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত' কাণার সুখ-দুঃখ তোমরা বুঝিবে না; সে নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ—যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ-দুঃখ আমাতেই থাকুক।

ছোটবাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত' সেইজন্য ঘুম হইতেছিল না!

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?"

ছোটবাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোটবাবু। তুমি কি উহার বিবাহের জন্য টাকা দিবে?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই। আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়ে-মানুষ সকল কথা ত' জানে না। বিবাহ কি হয়?"

ছোটবাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে-মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে-করিতে আমি সেই স্থান হইতে পলাইলাম।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট জড়পদার্থ-
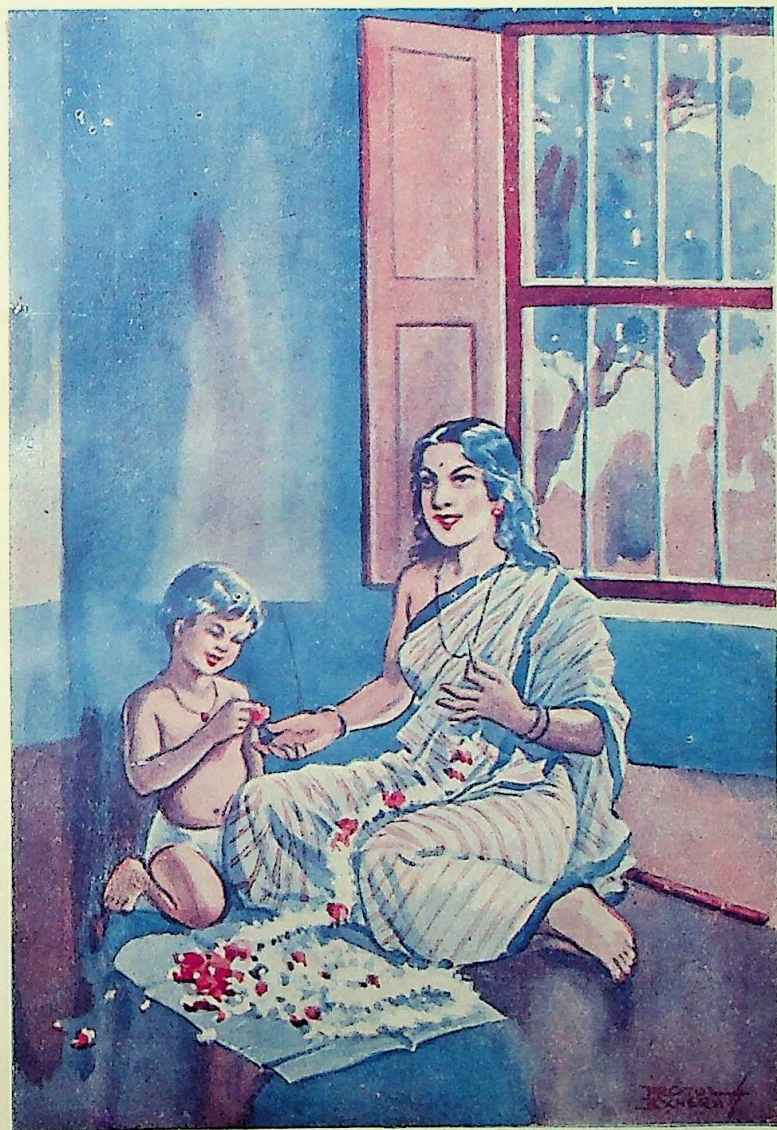
"হ্যাঁ গা, বলে কি কলে গা ? রজনী বলিল, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।"
বামাচরণ স্বামীর কর্তব্য বুঝিয়া ফুলগুলি গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। ৪ পৃষ্ঠা

সকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে-যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তাহা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট-পতঙ্গ অবধি দেখে, আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখন দেখিব না?

না, না। অদৃষ্টে নাই। হৃদয় মধ্যে খুঁজিলাম, শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখাগো—আমায় রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না, কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে —আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত, তবেও-বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই, অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকট আসিতেন। আমি যে-সময় ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই-বা সম্ভাবনা কি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত, প্রত্যহই আবার যাইতাম, আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম, মনে-মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে? আমি কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গী, এসরাজ,

বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ ? সেকথা মিথ্যা ! তবে কি সেই স্পর্শ ? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি ?

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ ! রূপ ! আমার কি রূপ ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায় ? আমাকে দেখিলে কখন কি কাহারও ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই ? এমন নীচাশয় ক্ষুদ্র কি কেহ জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে ? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দরী হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর ক্ষোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন ? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী-মাত্র ? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না ? এ সংসারে বিধাতা নাই—বিধান নাই, পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এ জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে-বৎসরে বহু দিবস—দিবসে-দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে-দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য আমার চক্ষু কি ফুটিবে না ? এক মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি ?

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোটবাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না। কিন্তু কদাচিৎ দুই একদিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি যেইরূপ আহ্লাদ হয়, আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে কতগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন, কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না; পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি মালা গাঁথিতে-গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড়মানুষ লোকে কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গালী নয়—হাজার দুই-হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয়বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেইদিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়? ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেদিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেইদিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত' হয়েছে! তাতে আবার ছোটবাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।

হরনাথ বসু রামসদয়বাবুর সরকার, গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু-কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাঁহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোটবাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না। কিন্তু কদাচিৎ দুই একদিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি যেইরূপ আহ্লাদ হয়, আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে কতগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন, কি বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না; পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি মালা গাঁথিতে-গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড়মানুষ লোকে কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা পরে এত কর্‌বে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গালী নয়—হাজার দুই-হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয়বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেইদিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়? ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেদিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেইদিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত' হয়েছে! তাতে আবার ছোটবাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।

হরনাথ বসু রামসদয়বাবুর সরকার, গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু-কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাঁহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে

তাঁহার আপত্তি নাই। বিশেষ, লবঙ্গ তাঁহাকে টাকা দিবে। পিতামাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতা-মাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে-মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি-দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি বড়মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তার পর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়, সে-ও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড়মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ, অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ

নাই, তাহাকে নিরপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি এই-এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয়বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব? পূর্ব্বমত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে, আগে কোন্ দিক্ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না। কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনি প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে!"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন, ছোটবাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম, বলিলাম, "কেন, আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই না কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, "পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবি না কেন?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গ বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বেরো বলিতেছি —নহিলে মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম,—আমার দুই অন্ধ-চক্ষে জল পড়িতেছিল। তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কৈ, তিরস্কারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই-একবার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদ-বিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোটবাবু আমার নিকটে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রজনি?"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম, অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম, কাণে বাজিতে লাগিল, "কে, রজনি?" আমি উত্তর করিলাম না। মনে করিলাম, আর দুই-একবার জিজ্ঞাসা করুন, আমি শুনিয়া কাণ জুড়াই।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনি, কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল। চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না, আরও জিজ্ঞাসা

করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছিলেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?"

আমি সেবার উত্তর করিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোটবাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোট মা'র কথা ধরিও না, তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম। তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন, আমিও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ উঠিতে-ছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখিতে পাও না, সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি আমার হাত ধরিলেন। যখন সিঁড়ির উপর উঠিয়া ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন,—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—সেই সঙ্গে মনে পড়িল—"কি করিলে! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী। ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু ছোট মা'র কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা! সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মা'র কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এদিকে গোপালবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করি—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক। এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোটবাবু ঘটক! আমি একা, অন্ধ, কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতা-পিতা মনে করিলেন, বিবাহ-আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ-বিবাহে অসম্মত।

চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়, তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট।

একান্ত অসৎচরিত্র। খবরের কাগজে লেখা হইতে ব্যবসাদারি, নানারকম কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই অর্থের সুবিধা করিতে পারে নাই। অর্থের প্রতি বড়ই টান।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত'? যে-ই কাণিকে বিবাহ করিবে, সে-ই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সেই বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন; আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি! না দিলে ত' বিয়ে হয় না—এত কাল ত' হলো না।"

হীরালাল। কেন, কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরীব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে ? তাতে আমার কাণা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি ? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়স্থা মেয়ে ত' লোকে চায়। বাল্য-বিবাহ—ছি! ছি! মেয়ে ত' বড় করিয়াই বিবাহ দিবে! এসো! আমাকে দেশের উন্নতির এক্জাম্পল্ সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিবাহ করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি! পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত-বড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষে একটু দুঃখিত হইলেন। শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হয় না, বিশেষ এ-বিবাহের কর্ত্তা, শচীন্দ্রবাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপালবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাহাদের মতলব তুমি কি বুঝিবে ? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাহাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি-চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, "সে কি ? না—আমার কাণা মেয়ে।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। চারিদিক্ হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম—যোড়হাত করিয়া বলিলাম, "আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড়ো থাকিব।"

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?" তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। ডুবিলাম।

সেইদিন বৈকালে কেবল গৃহে আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছেন,—মাতা দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ-সব যে-সময়ে হয়, সে-সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এইদিন বসিয়া ছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা-পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা!"

উত্তর, "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম,—"আমার কি যম আছে? তবে এতদিন কোথায় ছিলে?"

স্ত্রীলোকটির রাগ-শান্তি হইল না। "এখন জান্‌বি। বড় বিয়ের সাধ। পোড়ারমুখী! আবাগী!" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখ কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যেদিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেইদিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

এত গালির উত্তরে সাদর-সম্ভাষণ দেখিয়া চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ-মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের হাতে-পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি ?"

আমি। কি ?

চাঁপা। দুই দিন লুকাইয়া থাকিবি ?

আমি। কোথায় লুকাইব ? আমার স্থান কোথায় আছে ?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি ?"

ভাবিলাম, মন্দ কি ? আর ত' উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে ? তাহারাই-বা স্থান দিবে কেন ?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কু-প্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল ; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে-সব বন্দোবস্ত আমি করিব ! আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ ত' বল ?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে তুই ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব, বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌ঠক্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র লইয়া আমি দ্বারোদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না, একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি! পিতা-মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে-মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুরবাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সদ্যই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনি তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল?

হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্য আপত্তি করি নাই। আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে-সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে-সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাহারে বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে

...শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম। চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল।

২৯ পৃষ্ঠা

হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন, তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না ; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য ?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক-নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। আমরা যাহাকে পীড়ন বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত-পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সে-ই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র-পথ ছাড়িয়া চলিব কেন ?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল! পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই, দুই-একখানা গাড়ীর শব্দ—দুই-এক জন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরালালবাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন ?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি।"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

৩

হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন, তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না ; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য ?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক-নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। আমরা যাহাকে পীড়ন বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত-পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সে-ই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র-পথ ছাড়িয়া চলিব কেন ?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল ! পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই, দুই-একখানা গাড়ীর শব্দ—দুই-এক জন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরালালবাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন ?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি।"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি ?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার ?

হীরা। সাধ্য কি ?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে,—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত' হইবে না—আমায় বিবাহ কর।"

আমি বলিলাম, "না।"

হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে—বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ, আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পর শেষ-রাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।"—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল! মাঝিদিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ!" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল, দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত' এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম, রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকার পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত-শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হীরা। দেখা পেলে ত'? এ যে চড়া; চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল, শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে! কেহ কথা কহিলে—কত দূরে কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে কতদূর থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে-মনে অনুভব

করিয়া জলে নামিয়া সেইদিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশী জলে! নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এইদিকে এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমরজলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। —"খুন হইয়াছে,—খুন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল। সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে-দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্র গঙ্গা কলুষিত করিতে-করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন্ যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্রবাবু একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়; যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখ-ময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীট সকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ মনুষ্যজীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না।

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুল-গাছে শিমুল-ফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এইজন্য যে,

দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল-বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল-বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখে আর কয়-জনের দুঃখ হইবে? পরের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ-দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্রমাসে ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছিরা ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সেই শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীত-ব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ সান্ধ্যসমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ-আধ কথা ফুটিয়াছিল, জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুঞ্জি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই-বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে

দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে ? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায় ? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্য-ভাষাতে তেমন কথা নাই, মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, যেন তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া, শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে —কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি ? ইহা কি সামান্য দুঃখ ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার !

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন ? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না ? এই ত' কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গ-মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন ? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে ? মরিব !

আমি কেন জন্মিলাম ? কেন অন্ধ হইলাম ? জন্মিলাম ত' শচীন্দ্রের যোগ্য হইলাম না কেন ?

শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন ? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন ? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল ? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন ? এ-সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন ? এ-সকল কাহার খেলা ? দেবতার ? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব ? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে। তবে কি আমার কর্ম্মফল ? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ ?

দুই-এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব ! গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি ! না, মরিব ! চিবুক ডুবিল ! অধর ডুবিল ! আর একটুমাত্র। নাসিকা ডুবিল ! চক্ষু ডুবিল ! আমি ডুবিলাম !

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না ! আর-একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ু-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে-ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস অথবা পিত্রালয়—শান্তিপুর। আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎ কায়স্থ-কুলোদ্ভূত, আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে-কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে, আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে, আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না; তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরমাসুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলীন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে-করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে

এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে, এই কালিকাপুর সেই ভবানী-নগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে, কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে-মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে-মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে—'কয়ে করাত, খয়ে খরা' শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না, কিন্তু সেই সময়ে আমিও তাহাকে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে আমাদের বংশের এক প্রাচীন কলঙ্কের কথা কন্যাকর্ত্তার কাণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। ভবানীনগরের রামসদয় মিত্রের সহিত লবঙ্গলতার বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই, কোথাও স্থায়ী হইতে পারি না।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে

পারিতাম, মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে একদিনের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে-দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখ-রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ-দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত' আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত' কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে ত' নিজের আয়ত্ত। সুখ-দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জ্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জ্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন? জড়-জগৎ জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আমার অন্তরে যাহা আছে, যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, বাহ্যজগতে তেমন কোথায়?

একদিন নিশীথকালে—সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্কবদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে-দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পূরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিসের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলি গল্প বলিলেন—দুই-একটা-বা সত্য, দুই-একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্তবাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে এক-ঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং সে নিজেও রুগ্ণ। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।

"তাহার কন্যাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন, এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে'।

"আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া নন্দি-ভৃঙ্গি-সঙ্গে দেবাদিদেব দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটী-বাটি, পাথর-টুকনি, লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন।

"কেহ-কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে, কলিকাতায় তাঁহার কন্যা আছে, দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে!'

"তখন আমার দুই-একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়াছিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে।

"আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম, কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি, ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।'

"হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম, মনোহর দাস না?' "

গোবিন্দকান্তবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি?"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "রাজচন্দ্র দাস।"

আমি। তাহার বাড়ী কোথায়?

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "কলিকাতায়, কিন্তু কোন্ স্থানে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কন্যাটির নাম কি জানেন?"

গোবিন্দবাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ তাহার নাম 'রজনী' রাখিয়াছিলেন।"

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখনিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি, দুঃখনিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাব-মাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মনুষ্যই-বা কি চায়? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই—যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখন মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশ হেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী, অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথানিয়ার রাণী বলিত, সে-কথা

অদ্যাপি প্রচলিত ;—সেক্সপীয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছিলেন। যশ চাহি না।

যশ, সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়ের বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই-চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান—অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ? কতটুকু চাই? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট!

স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল? লইয়া কি করিব? প্রহার করিতে বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম ? লোকে বলে, ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ ; ইহকালের নয়। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা, কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে-দুঃখ নহে।

প্রণয় ? স্নেহ ? ভালবাসা ? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ, ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী—লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের ? আমার অভাব কিসের ? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব ? আমার কাম্যবস্তু কি ?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার, তাই আমার দুঃখ সার। কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই নাই ? এই অনন্ত সংসার অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছুই নাই ? দেখ, আমি কোন্ ছার্ ! টিণ্ডল, হক্‌সলী, ডার্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবন ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটা-ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না —তবু আমার কাম্যবস্তু নাই ? আমি কি ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা-আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই-এক জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।"

সে ত' প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়? রামের মা'র ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রঘো-পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর! এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ-সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে? কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তি-সকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, এইসকল কার্য্য আমার আমি যথাসাধ্য করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। খুঁজিয়া যখন সন্ধান মিলে না, তখন মনে হয়, এ-বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি—আমি, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু নহি। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন আনন্দ পাইবে, সেই খুঁজি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ-সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার, চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত' কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে ?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র, পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাঁহা-দিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে।—তাহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস, ভবানীনগর গ্রামে। তাহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম—মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম, মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কখনও ধনসঞ্চয় করিতেন না; বাঞ্ছারাম তাঁহার এইসকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ

বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষের কিছু-কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম, রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের প্রতি তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও নীরবে সহ্য করিলেন না।

পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইব না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবে না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহর দাসের

উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে এবং এক জন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন।

পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া আর পিতার কোন সংবাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছিল্য-বশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া, বাঞ্ছারাম তাহাকেও আর ডাকিলেন না!

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না। উইল অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমতকালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানী-নগরে গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোন সংবাদ নাই। পশ্চাতে জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিত অবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সংবাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন

সংবাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয়-কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরামবাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া, এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা-অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কষ্ট হওয়াতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যেই বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরামবাবু এ-সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল এবং বিষ্ণুরামবাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, যে-সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয়ত' নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য-কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্য্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে, চারিদিকে বৃক্ষরাজি, ঘনবিন্যস্ত, পাতায়-পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম; বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক জন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি—কোমরে দা'। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে-ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কঙ্কাল হইতে দা'খানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এ-স্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক; কিন্তু আমি ভীত হই নাই বা অস্থির হই নাই। অবকাশ

পাইয়া আমি বলিলাম, "তুমি এই সময় পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।"

যুবতী বলিল, "কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধকন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান্ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যেদিকে আমি দা' ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেইদিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া আগে গিয়া দা' কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা' পড়িয়া গেল; দা' তুলিয়া লইয়া আমাকে তিন চারি স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু কষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসিতে লাগিল; কিছু দূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিকলোক আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য

আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সেজন্যও বটে, অন্ধযুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে বহুকষ্টে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

আমি শয্যাগত হইবার পর অনুক্ষণ চিন্তা করিতাম, এ-মেয়ে কে? তবে কি যাহার অনুসন্ধান করিতেছি, এ সেই?

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যেদিন প্রথম সে আমার রুগ্‌ণশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?"

রজনীও বিস্মিত হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন?"

আমি স্পষ্টতঃ উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে ?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে ?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, বলিও না।"

বস্তুতঃ এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপালবাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, তাঁহার স্ত্রী চাঁপা, চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী, হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী যাইবে ?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপালবাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় সে আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমাকে হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল

সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল, কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নয় দেখিয়া সে আমাকে নিরাশ করিবার জন্য গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল। আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া মনে-মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম। তারপর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?"

রজনী ভ্রূকুটি করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

"তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন?"

"আমার যে দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

"আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে?' আমি বলিলাম, 'আমাকে

যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতা যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তারপর আপনি সব জানেন।"

আমি বলিলাম, "যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই?"

"সে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জান?"

রাজচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি-দুঃখে জান?"

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত' ভাবিয়া পাই নাই। সে অন্ধ, এইটি বড় দুঃখ বটে। কিন্তু তাহার জন্যও নয়; তাহার ত' সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলুম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে পলাইয়াছিল?"

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?

রাজ। গোপালবাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপালবাবু? চাঁপার স্বামী?

রাজ। আপনি সবই ত' জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম, তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে-কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি, আমার মেয়ে নয় ত' কাহার?"

"হরেকৃষ্ণ দাসের।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, এ-কথা রজনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না, কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, "আমি ত' তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না! অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে-দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ, গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিসে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে?

রাজ। আর কি করিব? আমি পুলিসকে বড় ভয় করি; রজনীর বালাচুরি-মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিসের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি-মোকদ্দমা কিরূপ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্র বক্তা

এ-ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ-অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। লোকে তাহার নিন্দা করিল। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম, শপথ করিতে পারি, সে কখন অসৎ হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, কাহাকেও ভালবাসিয়াছিল বলিয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি;—প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয়ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান-দুই-তিন বহি পড়িয়া মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি; যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহত্তত্ত্বের

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে চক্ষু চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম। ৫৬ পৃষ্ঠা

মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব? সন্ধান করিতে-করিতে জানিলাম যে, যে-রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমাসুন্দরী, কাণা হউক, এমন লোক নাই যে, তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?"

সে বলিল, "না।"

কি করিব? নালিশ-ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাস্কেলকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণ তারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই।

সে যাহাই হউক, আমি মধ্যে-মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতর প্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য। যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোট মা'র দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এই কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে-মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ-বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই-বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম,—তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোট মা সূচির ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে এক জন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই আপনি আত্ম-পরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস—শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কিজন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টানো শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, সেক্ষপিয়রের সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া, কালিদাস, ভবভূতি, তাহা হইতে ল্যাটিন কবিদের কথা, হক্‌স্‌লী ও ডারুইনের কথা আনিলেন। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যেজন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস, যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব, স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে-কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত। কেন না, তিনি কর্ত্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এজন্য আপনাকে বলিতেছি!"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয়?"

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি? সে যে রাজচন্দ্র দাসের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিতা কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা? কোথায় বিষয় পাইল? এ-কথা আমরা এতদ্দিন কিছু শুনিলাম না কেন?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী—মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। তারপর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিলেন, "তবে উকীলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরামবাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে,—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে?

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরামবাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরামবাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে, তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে?"

বিষ্ণুরামবাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয়?"

আমি। তা ত' জানি—কিন্তু সেও ত' মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পরে মরিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত' এক্ষণে কেহ নাই।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এতদিন সে-কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন ?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের এক জন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি ?"

"আছে" বলিয়া বিষ্ণুরামবাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন ; বলিলেন, "এ-বিষয়ে যে-যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদদাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম, রজনী।

যাহা প্রমাণ দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা

এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম এক জোবানবন্দীর জাবেদা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার ?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা—হরেকৃষ্ণ দাস ; ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালা-চুরির মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে, তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না ?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনি তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন, কত-দিনের জোবানবন্দী ?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "এই কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয়?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন, হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, একস্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোনার বালা দিলে কি প্রকারে?" হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোনার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই, তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার-খরচ দেয় ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোনার গহনা দিবার কারণ কি ?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ, সেজন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছেন।

জন্মান্ধ। তবে যে সে রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি ?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড় সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালা-চুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। সেই জোবানবন্দীতে বক্তা—রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস, সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে-সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাহার বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরানো নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত; আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত' সে বিষয় দখল করিল না!

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, সে সিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "টাকা কোথায় পাইলে?" রাজচন্দ্র বলিল, "অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন?" তাহাতে সে বলিল, "সে-সকল কথা অমরনাথবাবু জানেন।"

আমি। অমরনাথবাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন?

তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে-করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র, তোমায় এতদিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা-ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা-ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথবাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়া ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত'?

আমি। অর্থাৎ, পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথবাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হউক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া-খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত'?

রাজ। না না—তা কেন—তা কেন? আর-একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা, কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি!

আমি। কেন, অমরনাথবাবুর সঙ্গে ত' সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি। একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো-কথা ছাড়িয়া দাও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ, তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে দারিদ্র্য-

রাক্ষসকে দেখিয়া ভীত হইয়া পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল, সে কি বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিলেন—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে; নহিলে সপরিবারে মারা যাইব, খাইব কি? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া আমার মা'র হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মা'র কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে-রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, আজ তাহার টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোট-মা'র সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোট-মাই বুদ্ধিমতী। ছোট-মা'র কাছে গেলাম—

"ছোট-মা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

ছোট-মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে?

ছোট-মা। বাছা, রজনী ত' সৎ-কায়স্থের মেয়ে।

আমি। হইলই-বা।

ছোট-মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোট-মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু!

ছোট-মা। বাবা, যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ, তবে তোমার আর-একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তারপর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর-একজনকে বিবাহ করা কেমন কাজটা হইবে?

ছোট-মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড়-মা কি ঠেলা আছেন?

এ-কথার উত্তর ছোট-মা'র কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয়পক্ষের বনিতা। বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব, সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না,—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট-মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড় ?

ছোট-মা। তোমার আমার কাছে নহে ; কিন্তু যাহারা তোমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে। দেখ, তোমার জন্য আমরা তিন জনে প্রাণ দিতেও পারি, তুমি আমাদের জন্য একটি অন্ধকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না ?

বিচারে ছোট-মা'র কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল, আর মনে-মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ-বিবাহ করিব না।"

ছোট-মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যা-ই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ-বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমার এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট-মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট-মা বড় দুষ্ট। আমাকেই "বাবা' বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে-মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোট রকমের ফোঁটা, বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই; সন্ন্যাসিজাতির মধ্যে ইনি একটি বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে-মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক-যাগযজ্ঞে সুদক্ষ।

সন্ন্যাসীর সহিত ঘোরতর তর্ক জুড়িয়া দিলাম। সন্ন্যাসী আমার প্রত্যেক কথার যেভাবে বৈজ্ঞানিক-উত্তর দিলেন, তাহাতে আমার অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। ক্রমশঃ সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্ষমতা, ক্রিয়াকাণ্ডের কথা তুলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর, নলচালা?"

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নল্‌টি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে;

কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি। কিছু ইংরেজেরা জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ-পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না, কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও ?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—"

স। কিন্তু কি ?

আমি। কন্যা কৈ ? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালা দেশে কি তোমার যোগ্য কন্যা নাই ?

আমি। হাজার-হাজার আছে; কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে ? এই শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব ?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি।

বিস্মিত হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহিলাম।

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল পৃথিবীর মধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব; স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি, তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্না—কে?

"রজনী"

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?"

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা?

আমি। জন্মান্ধ।

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

———

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

সন্ন্যাসীর শক্তিতে আমার ধ্রুববিশ্বাস। তাই তাঁহাকে ধরিয়া আমি চেষ্টা করিতেছিলাম, যাহাতে শচীন্দ্রের সহিত রজনীর বিবাহ হয়। কিন্তু গোল বাধাইয়াছে—অমরনাথ। শুনিতেছি, অমরনাথের সঙ্গেই নাকি রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা! মালী-বৌ?"—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী-বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী-বৌ বলিতাম—মালী-বৌ বলিল, "কি গা?"

আমি। মেয়ের বিয়ে না কি অমরনাথবাবুর সঙ্গে দিবে?

মালী-বৌ। সেই কথাই ত' এখন হচ্ছে।

আমি। কেন হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল?

মালী-বৌ। কি কর্‌ব মা—আমি মেয়েমানুষ, অত কি জানি?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল,—আমি বলিলাম, "সে কি মালী-বৌ? মেয়েমানুষে জানে না ত' কি পুরুষমানুষে জানে? পুরুষমানুষ আবার সংসার-ধর্ম্ম কুটুম্ব-কুটুম্বিতার কি জানে? পুরুষমানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা

বহিয়া আনিয়া দিবে, এই পর্য্যন্ত—পুরুষমানুষ আবার কর্ত্তা না কি ?"

বোধ হয়, মোটা বুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত, অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন ?"

মালী-বৌ বলিল, "তাঁর মত নয়—তবে অমরনাথবাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে, তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথবাবুকে বল গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের ; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী-বৌ। সেকথা আগে বলিলেই হইত। এতদিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে ?

মালী-বৌ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ নাই। মালী-বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমরবাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমরবাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।

এই বলিয়া মালী-বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী-বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমরবাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার ?"

মালী-বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে !

আমি। আর, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হ'লে বুঝি বড় দুঃখ হবে ?

মালী-বৌ। তা কেন ? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাই না ?

মালী-বৌ। আমাদের আবার সুখ কি ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা ?

মালী-বৌ মুখ মুচকাইয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথাটা বলিব মা-ঠাকুরাণি ? এখানে বিয়েয় মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি ? কি বলে ?

মালী-বৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কাণার আবার বিয়ের কাজ কি ?

আমি। আর, অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে ?

মালী-বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব, উনি যা বলিবেন, তাই করিতে হইবে।

আমি। তা, বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি ? মা-বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী-বৌ। রজনী ত' ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি ?

আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখাশুনা হয় কি ?"

মালী-বৌ। না, অমরবাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি?

মালী-বৌ। আমারও ইচ্ছা তাই। আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া-পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন।

আমি। তা, চেষ্টা করিয়া দেখিব; কিন্তু রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে? কাল তাহাকে এ-বাড়ীতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার?

মালী-বৌ। তার আটক কি? সে ত' এই বাড়ীতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে-অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে?

"রজনী না আসিতে পারে, আমি তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি না?"

মালী-বৌ। সে কি! আমাদের এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়ীতে পড়িবে?

আমি। কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে! তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী-বৌ। তা, আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্ত্তার মত হইবে কেন?

আমি। পুরুষমানুষের আবার মতামত কি? মেয়েমানুষের যে মত, পুরুষমানুষেরও সেই মত।

মালী-বৌ যোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে-হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ব্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয় দখল লওয়া হয় নাই। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর দুই দিন যাক্। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রীও এ-বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয় সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয় একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না—কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে-বাড়ীতে আমার অবারিতদ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময় দেখিতে

পাইলাম, রজনী আর-একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা।

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র পরিয়াছিল—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল,—"রজনী, তুই এখন আর কোথাও যা। তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই! তোর বর সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।"

রজনী অপ্রতিভ হইয়া কি ভাবিতে-ভাবিতে সরিয়া গেল!

ললিতলবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, সেই মধুর হাসি হাসিয়া ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ অমরনাথকে কেহ আত্মবিস্মৃত হইতে দেখে নাই; আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারেও ললিতলবঙ্গলতা—এবারেও ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ? তোমার অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। হাসিয়া বলিল, তবে আমি রজনীর কাছে যাই ?”

“যাও।”

ললিতলবঙ্গলতা দুলিতে-দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে ; রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, “শুন তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে !”

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ?”

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, “বল। তোমার বর আসিয়াছে।”

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে আমার সম্মুখে শান্তকণ্ঠে বলিল, “আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, গ্রহণ করিবেন না কি ?”

আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন। লবঙ্গলতার প্রোজ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধনয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রভাসিত করিয়া এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সে দিন করিবেন না ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া অমরনাথ আগুনেসেঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কৈ, তা ত' কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত, হতবুদ্ধি, যা হইবার তাহা আমি হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনি, কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য! তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল,—"না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।"

আমি। অমরনাথবাবুকে?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না, আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথবাবু কি বল?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম, রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত; আবার অমরনাথ যে বিষয়

উদ্ধারের জন্য এত করিয়াছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে দেখিয়াও সে প্রফুল্ল, কাণ্ডখানা কি ?

আমি অমরনাথকে বলিলাম, "যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই।"

অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম, "সত্য-সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে ?"

"সত্য-সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদী কাপড় দিবেন !

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কি দিবেন ?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে-ধীরে বসিয়া পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম

বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রজনী! অত কাঁদ কেন?"

রজনী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব, আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ-জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?"

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, "শুনিব।"

তখন রজনী কাঁদিতে-কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, তাহার পলায়ন হইতে সমস্ত কথাই সে বলিল।

মনে-মনে বলিলাম, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্। তুই লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী!" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না রজনি! আমার বুড়া স্বামী—আমি অতশত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির?"

রজনী বলিল, "না।"

আমি। সে কি? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন?

রজনী। আমার সে সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কি? আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন পরের জন্য পরে কি তত করে? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, "যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে!"

রজনী বলিল, "আর একবার বসুন। আমি অমরনাথবাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

অমরনাথের সঙ্গে আর-একবার সাক্ষাৎ আমারও ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম, রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিল; আমি রজনীকে বলিলাম, "অমরনাথ-বাবু এ-বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।"

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে?"

অ। করিব—স্থির।

আমি। এখনও স্থির? রজনীর বিষয় ত' রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই ত' রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনিই কদর্য্য।

আমি। আমাদের উপর এমন অভক্তি কত দিন?

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া-বাছিয়া অন্ধ কন্যাতে এত অনুরাগ কেন? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম!

অ। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন? বিষয়ের জন্য কি?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না?

(কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা)

অমরনাথ বলিল, "ভয় করি বৈ কি? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমি রজনীকে তেমনি ভালবাসি।

আমি। কটাক্ষের গুণে নাকি?

অ। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।

অ। তুমি রজনীকে বিবাহ করিতে চাও নাকি?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অ। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র, আমি সুপাত্র জুটাইয়া দিব।

অ। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কাল হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ!"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব, শুনিবে?"

আমি কথা চাপা দিয়া দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"
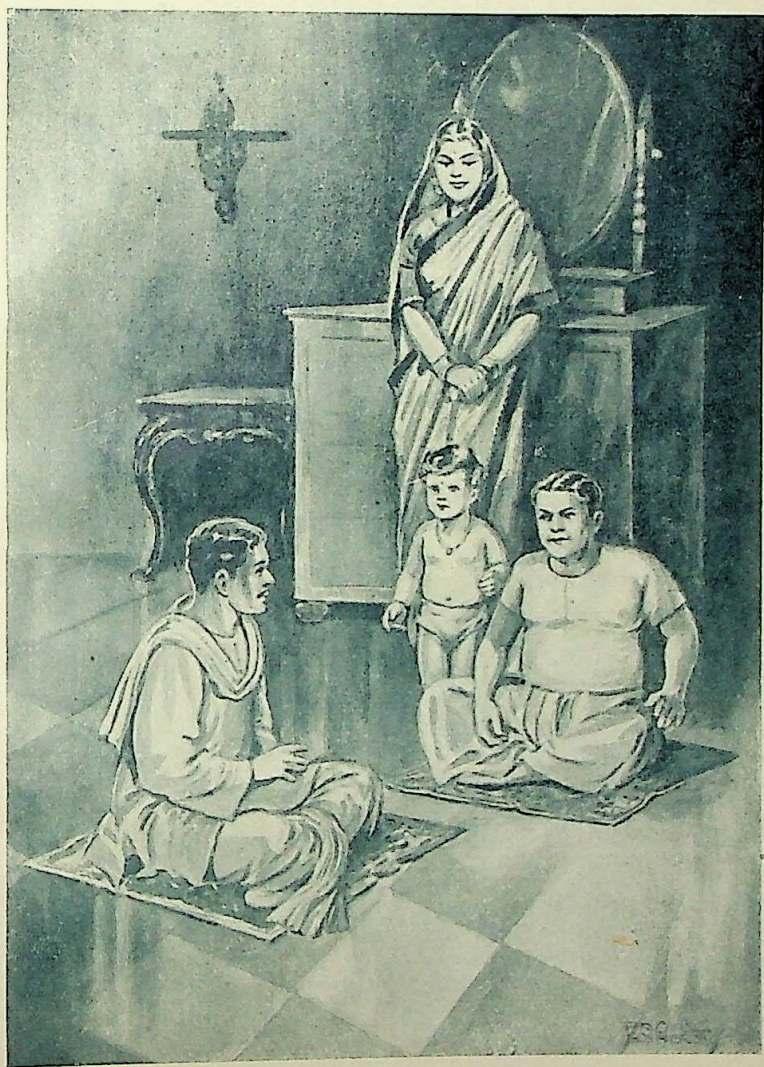
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার কি নাম রাখিয়াছেন ?"
শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

১০৪ পৃষ্ঠা

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, "প্রথম যৌবন কালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত।"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া আমার পিত্রালয়ে যে-ঘরে আমি এক পরিচারিকার সঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায় অমরনাথ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধ-পথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম, ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত' সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম।

অমরনাথ বলিল, "এ-সকল কথা কেন?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে, বল দেখি?

ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড়-বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না; কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম—

"চোর"

অমরবাবু, অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?"

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয় শুনাইও, তুমি শুনাও বা, না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি সকল শুনাইব। আমার দোষ-গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করিবে, না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হাসিয়া মনে-মনে অমরনাথকে শত-শত ধন্যবাদ করিতে-করিতে, হর্ষ-বিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য্য হারাইয়া কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। কি জন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

ঘন-ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। মূর্চ্ছার সকল লক্ষণ আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে-সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী ধীরে-ধীরে-ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম, আবার সেই রজনী, ধীরে-ধীরে-ধীরে জলে নামিতেছে! অন্যদিকে মন ফিরাইলাম, তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল। অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। সেই অন্ধ নারী আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। মাঝে-মাঝে শুধু অস্ফুট-কণ্ঠে আমার ভিতর হইতে কে যেন বলিত, "ধীরে, রজনী, ধীরে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্রনাথ একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে ; ছেলে-বয়সে অত ভাবিতে আছে ?

কিছুদিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

আদ্যোপান্ত শুনিলেন, পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া পীড়ার বৃত্তান্ত নানা প্রকার কথোপকথন করিবার পরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া মঙ্গল-জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ আপনি জানেন ?"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য !"

"তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনীর নাম করে কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "উহাই এই রোগের একটি প্রধান লক্ষণ।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার প্রতিকারের কি হইবে ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমি ডাক্তারী-শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু ডাক্তারেরা কখনও এ-সকল রোগের প্রতিকার করিয়াছে, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই ?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ ? আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক-পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে, ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রাকৃত অনুরাগ রুগ্ণাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

সেইসময় একজন পরিচারিকার সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কাহাকেও ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এক অন্ধ পুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।

আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে পারিলাম না।

রজনীকে বলিতে গিয়া দেখিলাম, রজনী কাঁদিতেছে। কেন কাঁদিতেছে, জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, সকল কথা লবঙ্গলতাকে সে বলিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ লবঙ্গলতার কাছে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, লবঙ্গলতা শচীন্দ্রনাথের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারাইবে,

নচেৎ উন্মাদ হইয়া যাইবে। আমি বিষ খাইয়া মরিব। আমি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে! ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে, আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার।

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে-কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল।

তারপর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী যে সকল কথা বলিতে বলিয়াছে, বল।"

লবঙ্গ তখন রজনীর কাছে যাহা-যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লেখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কৈ তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে—ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃৎপদ্মেই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

*　　　　*　　　　*

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তখন আমি ধীরে-ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেইজন্য একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমা কর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন!

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন,—"বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ-সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই ; অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে-দেশে বেড়াইবে ? আমি এখন ভাবিতেছি, যদি অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেইজন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।"

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব, এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্য, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি ?"

ল। শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও, আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন ? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?"

আমি। যাইব।

ল। কেন ?

আমি। যাইব না কেন ? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত' কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি ?

আমি। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে ?

ল। তুমি আমার কে ? তা ত' জানি না। এ-পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে ?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা।

আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।”

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, “আমি সে-কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখনো বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ-যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।”

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, “তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা-বুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে-সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?”

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই-বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে, তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না। আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখনও শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু-অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি অধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার

জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক্—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না, দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ, এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একেবারে ষ্টেশনে গিয়া বাষ্পীয়-শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে একদা ভ্রমণ করিতে-করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় বাস করিতেছেন। কৌতূহল প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্তধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন।

আমার নিজ সম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে-ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকটে গেলে, সে আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধূলি গ্রহণ কালে পাদস্পর্শ জন্য অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন

করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুগত নহে। চক্ষে-চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম, সে চক্ষে কটাক্ষ।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময় শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল, রজনী আসন রাখিয়া, আগে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া, জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব, স্পর্শের দ্বারা যখন সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে, তখন অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও?"

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল,—সে-সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে-সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই-এক জন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে-সকল লুপ্ত-বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন-কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ?' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।"

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য!"

এই কথা হইতেছিল, এমন সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে-টলিতে, চলিতে-চলিতে, পড়িতে-পড়িতে, উঠিতে-উঠিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া রজনীর পায়ের কাছে দুই-একটা আছাড় খাইয়া, তাহার

বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া, টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া উচ্চ-হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা!" (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ-মালা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

১। আনন্দমঠ

২। দেবী চৌধুরাণী
৩। কপালকুণ্ডলা
৪। বিষবৃক্ষ
৫। চন্দ্রশেখর
৬। দুর্গেশনন্দিনী
৭। কৃষ্ণকান্তের উইল
৮। রজনী
৯। রাজসিংহ
১০। সীতারাম
১১। রাধারাণী ও ইন্দিরা
১২। যুগলাঙ্গুরীয়
১৩। মৃণালিনী

১৪। কমলাকান্তের দপ্তর

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী উপন্যাস হইতে লিখিত

রাজমোহনের বউ ২৲

=রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থমালা=

১। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ১৲
২। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ১৲
৩। বঙ্গবিজেতা ১৲
৪। মাধবী কঙ্কণ ১৲
৫। সংসার ২৲
৬। সমাজ ২৲

=দামোদর গ্রন্থমালা=

১। মৃণ্ময়ী ১৲
২। তিলোত্তমা ১৲
৩। নবাব-নন্দিনী ১৲
৪। মা ও মেয়ে ১৲

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

১। আনন্দমঠ

২। দেবী চৌধুরাণী
৩। কপালকুণ্ডলা
৪। বিষবৃক্ষ
৫। চন্দ্রশেখর
৬। দুর্গেশনন্দিনী
৭। কৃষ্ণকান্তের উইল
৮। রজনী
৯। রাজসিংহ
১০। সীতারাম
১১। রাধারাণী ও ইন্দিরা
১২। যুগলাঙ্গুরীয়
১৩। মৃণালিনী

১৪। কমলাকান্তের দপ্তর

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী উপন্যাস হইতে লিখিত

রাজমোহনের বউ ২৲

=রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থমালা=

১। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ১৲
২। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ১৲
৩। বঙ্গবিজেতা ১৲
৪। মাধবী কঙ্কণ ১৲
৫। সংসার ২৲
৬। সমাজ ২৲

=দামোদর গ্রন্থমালা=

১। মৃণ্ময়ী ১৲
২। তিলোত্তমা ১৲
৩। নবাব-নন্দিনী ১৲
৪। মা ও মেয়ে ১৲